জনপ্রশাসন সংস্কার, সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও নাগরিক ভাবনা

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক, **১৪ জুন ২০১১**

ভূমিকা:

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহার অর্থাৎ 'দিনবদলের সনদ' ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগ ঘোষিত দিনবদলের সনদের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার ছিলো। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল সুশাসন প্রতিষ্ঠা। দিনবদলের সনদ অনুযায়ী, "দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমূখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। যোগ্যতা, জেষ্ঠ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতিনিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনিক সংস্কার, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ই-গভর্নেন্স চালু করা হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হবে"। আশার কথা যে, সরকার তার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রশাসনিক সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সরকার যদিও তার ক্ষতার অর্ধেক সময় পার করে দিয়েছে এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের দেখা প্রয়োজন যে সরকার কতটুকু অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে। বর্তমানে সরকার প্রশাসনিক সংস্কারেরর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার একটি সমন্বিত সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে। এই সংস্কারের অন্যতম উপাদান হল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অর্ন্তগত প্রশাসন ও কর্মরত ব্যক্তি অর্থাৎ লোকবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। মূল লক্ষ্য হলো একটি আধুনিক, দক্ষ, মেধাবী, সময়পোযোগি জনকেন্দ্রীক সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা যা সত্যিকার অর্থে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হবে। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার যা জনগণের দৃষ্টিগোচরে এসছে এবং সারা দেশে সচেতন নাগরিকগণ যেগুলো নিয়ে আলোচনা করছে তা হলোঃ

(১) প্রস্তাবিত সিভিল সার্ভিন আইন:

সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে তার ওয়েব সাইটে খসড়া সিভিল সার্ভিস আইন ২০১০ প্রকাশ করেছে। প্রস্তাবিত সিভিল সার্ভিস আইনের ওপর মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি করে সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের সাতটি বিভাগীয় কমিশনার অফিসের উদ্যেগে সিভিল সোসাইটি, জনপ্রতিনিধি, এনজিও এবং সাংবাদিক প্রতিনিধিদের সেমিনারে মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এর বাইরেও ডকযোগে ও ইমেইলে এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ মতামত পাওয়া গিয়েছে। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। যদিও আমরা আমাদের স্বাধীনতার ৪০ বছর পার করে ফেলেছি কিন্তু সেই ঔপনেবেশিক আমল থেকেই আমাদের মনস্তত্বে গেঁথে গিয়েছে যে, আমরা আমাদের প্রভু অর্থাৎ উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে সেবা প্রদান করবো কিন্তু জনগণকে নয়। কিন্তু আশার কথা হলো যে, খসড়া সিভিল সার্ভিস আইনে প্রশাসনের কর্তব্যরত ব্যক্তিদের জনগণকে সেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে এবং জনগণেরও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দৈনিক কাজের... । আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রস্তাবিত সিভিল সার্ভিন আইনের প্রধান ভিত্তি হলো জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, মেধা, কারিগরি দক্ষতা, জনকেন্দ্রীক সেবা প্রদান। আইনের অধ্যায়-৪ (সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার)এ বলা হয়েছে - সততা, পেশাদারিত্ব, ন্যয় ও সমতার নীতি গ্রহণ করে জনগণকে সেবা প্রদান করা; নিরপেক্ষতার নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি, শ্রেণী বা রাজনৈতিক দলের প্রভাবে বা অনুকূলে কাজ না করা এবং সেবা প্রদানের ক্ষেতে বৈষম্য না করা। যা সত্যিকার অর্থেই প্রশাসনকে জনগণের খুব কাছের প্রতিষ্ঠনে পরিণত করবে বলে সকলে মনে করেন।

সুশাসনের নীতিমালা, জনমূখী সেবা প্রদান এবং জনপ্রশানে নিয়োজিত কর্মীদের ক্ষোভ প্রশমনের বিষয়গুলোকে আইনে বিববেচনায় নেয়া হয়েছে। মন্ত্রনালসমূহের গুচ্ছায়নের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধারণা নতুন বিধায় এ বিষয়ে সিভিল সার্ভিস কর্মীদেরকে সচেতন করা গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রশাসনের কর্মীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ১৩টি নীতিমালার বিষয়ে খসড়া আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নীতিসমূহ সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত। তবে এ নীতিসমূহ যদি সুস্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা না হলে এক একজন কর্মীর নিকট একেকভাবে প্রতীয়মান হবে এবং এ নীতিমালাসমূহের মান কি হবে তাও সুস্পষ্টও নয়।

খসড়া আইনের ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিকটাত্মীয়ের সাথে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্মীর স্বার্থ জড়িত থাকলে নিজে সম্পাদন না করে তা উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবেন। খসড়া আইনের এই ধারাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। দুর্নীতি নিরসনে এবং প্রশাসনের নিয়োগের অধিকার নিশ্চিতকরণে নতুন মাত্রা যোগ করবে। কার্যসম্পাদনে জনপ্রশাসনের কর্মীদের ক্ষেত্রে এটি একটি রক্ষাকবচ হিসেবেও কাজ করবে।

খসড়া আইনে জনপ্রশাসনের কর্মীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতির কথা বলা হয়েছে। যদি সরকার সত্যিকার অর্থেই আইনটি প্রণয়ন করে তাহলে রাজনৈতিক বিবেচনায় কর্মী নির্বাচন ও পদোন্নতি অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়বে। এটা সত্যিই প্রশংসনীয় যে, কর্মী নির্বাচন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা এবং প্রতিযোগিতার বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই ধারাটি আরো সুস্পষ্ট করা এবং পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে সকল ক্যাডারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। এই ধারা সকল ক্যাডার সার্ভিসের কর্মীদের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কমিশনের মেধা তালিকা এবং বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ফলাফলের সমন্বয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করা হবে। এক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশণকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

প্রস্তাবিত আইনের ১২ (খ) ধারায় বলা হয়েছে "বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন" সরকার নির্ধারিত কারিগরি ও বিশায়িত পদে পদভিত্তিক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে। অন্যান্য পদে পদের উল্লেখ ব্যতীত নিয়োগের সুপারিশ করিবে।"
১২(গ) ও (ঘ) ধারায় বলা হয়েছে "কারিগরি ও বিশেষায়িত পদ ব্যতিত অন্যান্য পদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীদের নির্ধারিত মেয়াদে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।" প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিষয়ে 'সিলেকশন বোর্ড' প্রার্থীদের নিয়োগ পরিক্ষার ফলাফল এবং বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ফলাফল-এর সমন্বয় পূর্বক পছন্দের ক্রমানুসারে সার্ভিসের গুচ্ছ অনুযায়ী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে।" অর্থাৎ পিএসসি শুধু নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতে পাররবে। যোগ্যতা অনুযায়ী ক্যাডার নির্ধারণ করার ক্ষমতা পাবে পিএসসি'র বাইরে সরকারী সিলেকশন বোর্ড। আবার যারা প্রশিক্ষণে পাস করবে না তারা ক্যাডার সার্ভিসে চাকুরির জন্য অকৃতকার্য বলে বিববেচিত হবেন। এতে করে পিএসসি তার স্বাভাবিক স্বত্তা হারিয়ে ফেলবে বলে আমরা মনে করি। এতে করে জনপ্রশাসনে দলীয়করণের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সরকারের প্রভাবশালী মহলের তদবিরের বাইরে কারো চাকুরি হবে না। প্রশিক্ষণে পাস-ফেল এবং পছন্দের ক্যডার সার্ভিসে যোগ দেয়ার বিষয়টি তদবির আর টাকার খেলা ছাড়া সম্ভব হবে না। যা পরিণতি শুভ হবে বলে আমরা মনে করি না। আরো একটি বিপত্তি দেখা দিতে পারে যে, রাজনৈতিক সরকারগুলো তাদের আজ্ঞাবহ বিশিষ্ট লোকদের সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করবে এবং এসব বোর্ড থেকে প্রার্থীর বাস্তব যোগ্যতা বিববেচনা ছাড়াই ক্ষমতাসীন দলৈর ধরিয়ে দেয়া তদবির তালিকা বাস্তবায়ন করা হতে পারে। এতে করে মেধাবী পরিবারের সাধারণ ছেলে মেয়েদের ক্যাডার সার্ভিসে চাকুরি পাওয়া সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রশাসনকে দলীয়করণের রাহুমুক্ত করতে হলে সবধরণের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পরিহার করতে হবে। একান্ত প্রয়োজন হলে ডিউটি পদের বাইরে শুধু পরামর্শক হিসেবে কারিগরি পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তবে পরামর্শ দেওয়ার বাইরে তাদের হাতে ক্ষমতা প্রদান করলে তার ফল সুফল হবে বলে মনে হয় না। অথচ আইনের ৫ ধারায় ৩টি স্তরে মোট ৪০ শতাংশ পদ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এটা করা হলে প্রশাসন ভারসাম্য হয়ে পড়তে পারে। এ নিয়োগের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল ডিউটি পদে অপেক্ষমান থাকা কর্মকর্তার পদোন্নতি বন্ধ তাকা। বেশিরভাব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ায় সংশ্লিষ্ট পদের প্রত্যামী যোগ্য উত্তরাধিকার কর্মকর্তা চরমভাবে বঞ্চিত হন। অব্যাহত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কারণে পেছনের সিরিয়ালে থাকা কর্মকর্তাদের পদোন্নতির পদ রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং অনেকে প্রাপ্য পদোন্নতি ছাড়াই অবসর গ্রহণ করেন।

অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি কর্মকর্ত মানে চাকরি আছে, বেতনও আছে কিন্তু কোন কাজ নেই। বর্তমানে সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত ২৪২ জন কর্মকর্তা ওএসডি আছে। এদের মধ্যে সচিব ৭জন, অতিরিক্ত সচিব ৩৮ জন, যুগ্ম সচিব ৮৪ জন, উপ-সচিব ৬৭ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ৩৪ জন এবং সহকারী সচিব ১২ জন। বেশিসংখ্যায় ওএসডির কারণে অর্থ ও মেধার অপচয় ছাড়াও প্রশাসনে এক ধরনের স্থবিরতা নেমে এসেছে। সবমিলিয়ে ২৪২ জন ওএসডি কর্মকর্তার পেছনে সরকারের প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে ৯৬ লাখ ৬১ হাজার টাকা যা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিসয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

জনপ্রশাসন কর্মীগণ স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ ও স্বেচ্ছা পদত্যাগ করতে পারবে। আইনের ধারা ১৮ ও ১৯ এ বলা হয়েছে যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাকরি হতে পদত্যাগ এবং চাকরিকাল ২০ বছর অতিবাহিত হলে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করতে পারবে। শৃঙ্খলাজনিত কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করে এবং বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন সদস্যকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর, অপসারণ বা বরখাস্ত করা যাবে না। এই ধারা জোরপূর্বক অপসারণ আইন ১৯৭৪ কে অবৈধ বলে উল্লেখ করে যা সত্যিই প্রশংসনীয়। অতীতে এই কালো আইনের কবলে পড়ে জনপ্রশাসন কর্মীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং নূন্যতম মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে ।

এই আইনের ধারা ২১ এ বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সদস্য আইনানুগভাবে দায়িত্ব পালনকালে ক্ষতিগ্রস্থ হলে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী হবেন। দায়িত্বপালনকালে উদ্ভূত কোন ঘটনার কারণে কোন ফৌজদারী অপরাধ সংগঠিত হলে সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন আদালত উক্ত অপরাধের জন্য কোন মামলা গ্রহণ করতে পারবে না বা কোন কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। আমরা মনে করি যে, এটি অত্যন্ত বিপদজনক ধারা। এর ফলে জনপ্রশাসনের কর্মীগণ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া এই ধারা জনপ্রশাসন কর্মীদেরকে নাগরিকদের প্রতি দ্বায়বদ্ধতার পরিবর্তে বরং রাষ্ট্রের আইন না মানার প্রতি আকৃষ্ট করবে। বিষয়টি আরো গভীরভাবে চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে।

(২) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় নামে নামকরণঃ

সম্প্রতি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই নামকরণের উদ্দেশ্য এরে নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যদিও জনপ্রশাসন নিজেই কাজের পরিধি সম্পর্কে এখনো জ্ঞাত নয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের ওপর অর্পিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন সেজন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত সক্ষমতা তৈরি প্রয়োজন।

(৩)সেবা সরবরাহ উন্নয়নের জন্য নাগরিক সনদের বাস্তবায়নঃ

২০০৭ সালে সরকার নাগরিক সনদের কথা বলে যা সেবা সরবরাহকরণে একটি উপাদান হিসেবে কাজ করবে। প্রত্যেক সরকারী প্রতিষ্ঠানে নাগরিক সনদ থাকবে যা প্রতিনিয়তই আপডেট করতে হবে এবং নাগরিকদের এতে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সেবা প্রদান করবে সেখানে জনগণের ফিডব্যাক থাকা প্রয়োজন। নাগরিকগণ এবং সেবা গ্রহীতাগণকে এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে তারা এর মান উন্নয়নে সচেষ্ট হয়।

(৪) ই-গর্ভন্যান্সঃ

উপসংহারঃ

সিভিল সার্ভিসের নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, সংস্কারের যে ছোঁয়া এখানে লেগেছে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটা সত্য যে গত তিন দশকে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং আমরা শুধুমাত্র নানা প্রতিবেদন ও সুপারিশই দেখেছি কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য কোন পরিকল্পনা বা উদ্যেগ দেখি নি। এইবার আমরা সরকারকে কিছু চিন্তা করতে এবং কার্যকর করতে দেখছি। যাইহোক সরকারের সংস্কারের উদ্যোগগুলি নিয়ে সিভিল সার্ভিসের অভ্যন্তরের এবং বাইরের জনগণ সকলেই সচেতন এবং এই সংস্কার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সক্ষমআ তৈরী করতে হবে। সরকারের এই সকল উদ্যোগ বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার নির্ণয় করা উচিৎ এবং রোডম্যাপ ঘোষণা করা উচিত। সংস্কারের উদ্যোগ বাস্তবায়ন জনপ্রশাসনের কর্মীদের মানসিকতার পরিবতর্ন, নতুনত্ব আনয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশাসনে স্থায়িত্ব আনয়নে ভূমিকা রাখবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এখনই সময় দীর্ঘ ২০০ বছরের ঔপনেবেশিক শাসনামলের আমলাতন্ত্র অবসান করার এবং দলীয়করণমুক্ত জনপ্রশাসন তৈরী করার।

সকল বাধা সত্ত্বেও আবারো আমরা বলতে চাই যে, জনপ্রশাসন সংস্কারের বিকল্প নাই যা আমাদের দেশের দারিদ্র দূরীকরণসহ মানব উন্নয়নে বিশেষত এমডিজি অর্জনে ভূমিকা রাখবে।